ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

একজন বিশিষ্ট বাঙালীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জে একসময় উচ্চ-পদাধিকারী ছিলেন, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। কর্মের সুবাদে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা স্থানে তাঁকে ঘুরতে হয়েছে। জন্মসূত্রে ভারতবর্ষকে তাঁর ভালভাবেই জানা ছিল, কর্মসূত্রে পাশ্চাত্যকে নিবিড়ভাবে দেখার সুযোগও তাঁর ঘটেছে। তিনি বলছিলেন : "দুঃখ হয় আমাদের দেশের জন্য। পাশ্চাত্যের তুলনায় শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছি। দারিদ্র্য, বেকার-সমস্যা, কর্মসংস্কৃতির (work culture) অভাব দেশের এখনো কঠিন সমস্যা। এর জন্য বড় রকমের দায়িত্ব আমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতির। অস্থির ও মূল্যবোধহীন রাজনীতি আমাদের সমাজকে শেষ করে দিচ্ছে। তার সঙ্গে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা ধর্মীয় মৌলবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও গণহত্যা। রাজনৈতিক সুবিধাবাদ অথবা সুবিধাসর্বস্ব রাজনীতি অবশ্য এই সমস্যার মূলে।

"আবার রয়েছে অনুকরণের সর্বনাশা নেশা। সেই কোনসকাল বিবেকানন্দ আমাদের ঘৃণিত জঘন্য দাসসুলভ অনুকরণপ্রিয়তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলেন; তার পরেও কতবছর চলে গেল, কিন্তু তা আজও গেল না। ভাল জিনিস নিতে তো কেউ বারণ করছে না, কিন্তু আমরা সেই 'ট্র্যাডিশন' সমানে চালিয়ে যাচ্ছি—পাশ্চাত্যের শুধু খারাপ জিনিসটাই নিচ্ছি। তাদের কর্মসংস্কৃতিটা তো নিচ্ছি না। তাদের পরিশ্রমী স্বভাব, তাদের কর্মনিষ্ঠা, তাদের সময়ানুবর্তিতা, তাদের ব্যবহারিক সততা—এসব কোন কিছুই আমরা নিচ্ছি না। নিচ্ছি কোনযাটা—তাদের দাম্পত্যজীবনের স্বেচ্ছাচারিতা, তাদের যৌনতা, তাদের আত্মকেন্দ্রিকতা, তাদের জীবনবোধের লঘুতা। দূরদর্শন খুললেই দেখা যায় কত নগ্নভাবে পাশ্চাত্যকে আমরা অনুকরণ করছি। আমাদের সমাজ, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের সংস্কার, আমাদের মানসিকতা ওগুলিকে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়, অথচ ওগুলিকে নেওয়ার জন্য আমরা দুহাত তুলে দৌড়াচ্ছি। এর ধাক্কায় আমরা হারাচ্ছি আমাদের মৌলিকতা। আমাদের শিকড় থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। সবচেয়ে দুঃখের কথা, সাঁওতালরা, আদিবাসীরা, উপজাতিরা—যারা নিজেদের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে এতদিন প্রচণ্ড রক্ষণশীল ছিল, দূরদর্শনের সূত্রে তারাও আমাদের মতো নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভুলে চটুল ও অন্তঃসারশূন্য পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে"।

জানতাম, ভদ্রলোক তথাকথিত অর্থে ধর্মে বিশ্বাসী নন। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : "বাঁচার পথ কী?" তিনি একটি বাক্যে বললেন : "নিজেদের ঐতিহ্যে শ্রদ্ধা এবং চরিত্রগঠন।" আমি বললাম : "কিন্তু আপনি যদি ইতিহাস মানেন, তাহলে আপনি স্বীকার করবেন যে, আমাদের 'ঐতিহ্য' মানেই ধর্ম। আমাদের 'ঐতিহ্য' তো ধর্মকেন্দ্রিক। আমাদের 'ঐতিহ্য' মানেই তো বেদ-উপনিষদ্, গীতা-ভাগবত, রামায়ণ-মহাভারত, রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-চৈতন্য আর 'চরিত্র' মানে একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শবোধ ও উন্নত জীবনবোধে অবিচলিত বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ভারতীয় ঐতিহ্যমতে কিন্তু আসে ধর্মবোধ থেকে বা ধর্মের প্রেরণায়। স্বামীজী বলেছেন, 'ধর্ম মানে চরিত্র। সেটাই প্রকৃত শক্তি।' সুতরাং ঐতিহ্য বলুন অথবা চরিত্র বলুন—ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ডে দুটোরই ভিত্তি কিন্তু ধর্ম।"

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন : "হ্যাঁ, ভারতের ইতিহাস তাই বলে বটে"। আমি বললাম : "তাহলে বাঁচার পথ কি ধর্ম?" তিনি বললেন : "হ্যাঁ, তাই। তবে ধর্ম মানে নিশ্চয়ই মন্দির-মসজিদ-গির্জা অথবা সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রত-উপবাস, নিরামিষ-ছোঁয়াছুঁয়ি নয়?" আমি বললাম : "অবশ্যই নয়। ধর্ম বলে, যতক্ষণ ঐসমস্ত তোমার জীবনকে শুভের পথে নিয়ন্ত্রণ করে, পরিচালনা করে, জীবনকে ঊর্ধ্বমুখী করে ততক্ষণ ওগুলির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক। তা না হলে ওগুলির সঙ্গে ধর্মের দূরতম সম্পর্কও নেই। ওগুলি ধর্মের 'বহিরঙ্গ' বলে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত।"

ভদ্রলোক বললেন : "তাহলে ধর্মের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই—শুধু আমার কেন, কারোরই কোন বিরোধ থাকতে পারে না।" আমি বললাম : "বাস্তবিক, ধর্ম এমন একটি বিষয় যা আকাশের মতো উদার এবং সমুদ্রের মতো গভীর।"

আমাদের আলাপ সেদিন সেখানে শেষ হয়েছিল। কিন্তু সেই আলাপের সূত্রে ধর্মের তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু কথা আমাদের মনে জাগছে। 'ধর্মের তত্ত্ব' কথাটি মহাভারতের বনপর্বে বকরূপী ধর্ম বা যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন : ''ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্''। ধর্মের তত্ত্ব অতিশয় গূঢ়। (দ্রঃ মহাভারত, ৩। ৩১৩। ১১৭) বাস্তবিক, 'ধর্ম' কথাটি আমরা বড় সহজে বলি বা ব্যবহার করি, কিন্তু ধর্মের মর্মকে অনুধাবন করা, ধর্মের তত্ত্বকে উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন।

ধর্ম সম্পর্কে এখন যেন অনেকের একটা 'অ্যালার্জী'র মনোভাব দেখি। ধর্ম মানেই যেন কুসংস্কার। ধর্ম মানেই যেন ঝগড়া-বিবাদ, রক্তারক্তি। ধর্ম মানেই যেন অসহিষ্ণুতা, ধর্ম মানেই যেন সাম্প্রদায়িকতা। ধর্ম মানেই যেন মৌলবাদ। ধর্ম সম্পর্কে এই ধারণার জন্য দায়ী আমরাই। তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বলে যাঁদের পরিচিতি, প্রগতিশীলতার তকরযমাঁদের পোশাকে আঁটা, প্রধানত তাঁরাই 'ধর্ম' জিনিসটিকে আজ প্রায় অস্পৃশ্য একটি বিষয়ে দাঁড় করিয়েছেন। 'আমি ধর্ম মানি না', 'আমি ধর্মে বিশ্বাস করি না'—একথা বলা যেন এক বিরাট গর্বের বিষয়। ব্যাপারটি এমনই এক জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে, যে 'বুদ্ধিজীবী' বা যে 'প্রগতিশীল' ব্যক্তি ধর্মকে যত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারবেন তাঁর জন্য যেন তত বেশি মর্যাদা সংরক্ষিত। ধর্মে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা নাকি কুসংস্কারগ্রস্ত, যুক্তিহীন ভাবালুতায় আচ্ছন্ন ধর্মকে না মানাটাই 'প্রগতিশীলতা'র মাপকাঠি, ধর্ম না মানাটাই 'যুক্তিবাদ', যাঁরা ধর্ম মানেন না তাঁরা 'যুক্তিবাদী'!

প্রথাবিরোধী বা ঐতিহ্যবিরোধী কিছু বললে বা করলে কিছু লোক থাকেই, যারা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তার সমর্থনে নৃত্য করতে শুরু করে। অপর পক্ষে, যারা 'ধর্ম ধর্ম' করে নানা ভাবালুতায় মত্ত হয় বা আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজালে নিজেদের আবদ্ধ করে ফেলে তারাও তাদের ক্ষেত্রে কম ঊর্ধ্ববাহু নয়। কিন্তু উভয় দলের কেউই কখনো মূল ধর্মের প্রতি, ধর্মের মূল বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। একদল ধর্মকে বাদ দিতে গিয়ে ঢাকের সঙ্গে ঢাকিকেও বিসর্জন দেয়, অন্যদল ধর্ম পালন বা ধর্মকে আশ্রয় করার নামে 'শাঁস'কে বাদ দিয়ে 'খোসা' নিয়ে মাতামাতি করে।

উভয় পক্ষের কাছে আমাদের বক্তব্য : আপনারা যুক্তির নামে অযৌক্তিক অহমিকাকে প্রশ্রয় দেবেন না অথবা অর্থহীন আচারসর্বস্বতায় গা ভাসাবেন না। অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানাদিকে নির্বিচারে মানাও যেমন কুসংস্কার, তেমনি লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাব ও আচরণকে নির্বোধ ভাবালুতা বলে বিদ্রূপ করাও কুসংস্কার। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা যদি কুসংস্কার হয় তাহলে মার্ক্স, এঙ্গেলস, ফ্রয়েড, আইনস্টাইন, হকিং বা আধুনিকতম কোন মনস্তত্ত্ববিদ্ বা বৈজ্ঞানিককে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে তাঁদের দেবতা বানানোও তো কুসংস্কার। একটি যদি হয় 'ধর্মীয়' কুসংস্কার, তাহলে অপরটি হবে 'বৈজ্ঞানিক' কুসংস্কার। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মানুষকে ঈশ্বররূপে পূজা বা সর্বাঙ্গসুন্দররূপে দেখা যদি অপরাধ হয়, তাহলে সেই অপরাধে তো 'যুক্তিবাদী'রাও অপরাধী। মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন প্রমুখকে তাঁরা যেখানে বসান তা তো ভক্তিবাদীদের ঈশ্বরের স্থানের সমতুল, হয়তো বা ভক্তিবাদীদের ঈশ্বরের চেয়েও উচ্চতর সেই আসন।

বস্তুত, কুসংস্কার বলে যদি কোন কিছুকে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে তা অসহিষ্ণুতা। সেই অসহিষ্ণুতাই মৌলবাদের জনক। আজকাল 'মৌলবাদ' কথাটি প্রধানত ধর্মীয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, কিন্তু তা কেন হবে? মৌলবাদ রাজনৈতিক ক্ষেত্রকেও তো একইভাবে আশ্রয় করছে, বিজ্ঞানজগৎকেও করছে। সাংস্কৃতিক জগৎকেও করছে। যেখানে 'আমার' মতই সর্বশ্রেষ্ঠ—এই 'বাদ' বা এই বুদ্ধি ক্রিয়াশীল, সেখানেই তো মৌলবাদ দানা বাঁধে বা আত্মপ্রকাশ করে।

আজ সকলের প্রয়োজন খোলা মন নিয়ে ধর্মের বিষয়টি বিচার করা। আমাদের জানা প্রয়োজন, ধর্ম বলতে কি এবং কাকে বোঝায়। ধর্ম কি এবং কেন? বস্তুত, ধর্ম এমন একটি বিষয় যার ক্ষেত্র প্রধানত মনে, বাইরে কোথও নয়, ধর্ম মানে বিকাশ। ধর্ম হলো এমন এক প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি বা বিকাশ যা আচারগত নয়—আচরণগত। সেটিই যথার্থ বিকাশ, যে প্রক্রিয়ায় কোন অবৈজ্ঞানিকতার লেশমাত্র নেই, কোন অযৌক্তিকতার চিহ্নমাত্র নেই। সমস্তটিই আগাগোড়া সেখানে যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। রামকৃষ্ণদেব একটি সুন্দর গল্প বলতেন :

''একজনের দুই ছেলে ছিল। বড়র যৌবনেই বৈরাগ্য হলো ও সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল। আর ছোট বিবাহ করে সংসারধর্ম করতে লাগল। সন্ন্যাসীদের নিয়ম—বারবৎসর অন্তে, ইচ্ছা হলে একবার জন্মভূমি দর্শন করতে যায়। ঐ সন্ন্যাসীও ঐরূপে বারবৎসর বাদে জন্মভূমি দেখতে আসে এবং ছোট ভাইয়ের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে তার নাম ধরে ডাকতে লাগল। নাম শুনে ছোট ভাই বাইরে এসে দেখে—তার বড় ভাই। অনেক দিন পরে

ভাইয়ের সঙ্গে দেখা, ছোট ভায়ের আর আনন্দের সীমা রইল না। আহারান্তে দুই ভাইয়ের নানা প্রসঙ্গ হতে লাগল। তখন ছোট বড়কে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, তুমি যে এই সংসারের ভোগ-সুখ সব ত্যাগ করে এতদিন সন্ন্যাসী হয়ে ফিরলে, এতে কি লাভ করলে আমাকে বল।' শুনেই দাদা বলল, 'দেখবি? তবে আমার সঙ্গে আয়।'—বলেই ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির নিকটে নদীতীরে এসে উপস্থিত হলো এবং বলল, 'এই দেখ।'—বলেই নদীর জলের ওপর দিয়ে হেঁটে অপর পারে চলে গেল। গিয়ে বলল, 'দেখলি?' ছোট ভাইও পার্শ্বের খেয়ানৌকার মাঝিকে আধ পয়সা দিয়ে নদী পেরিয়ে বড় ভায়ের নিকটে গিয়ে বলল, 'কি দেখলুম?' বড় বলল, 'কেন? এই হেঁটে নদী পেরিয়ে আসা?' তখন ছোট ভাই হেসে বলল, 'দাদা, তুমিও তো দেখলে—আমি আধপয়সা দিয়ে এই নদী পেরিয়ে এলুম। তা তুমি এই বারবৎসর এত কষ্ট সয়ে এই পেয়েছ? আমি যা আধপয়সায় অনায়াসে করি, তাই পেয়েছ? ও ক্ষমতার দাম তো আধপয়সা মাত্র।' ''

ধর্ম মানেই যুক্তি। যে-উপলব্ধি যুক্তিতে দাঁড়ায় না, যে-অনুভূতি বিজ্ঞানসম্মত নয়, যে-দর্শন শুধু কল্পনাবিলাস, তার কোন মূল্য ধর্ম স্বীকার করে না। ধর্ম বলে, যদি তোমার উপলব্ধি যুক্তিসিদ্ধ না হয়, যদি তোমার অনুভূতি তোমার আচরণে প্রতিফলিত না হয়, যদি তোমার দর্শনকে অপরের কাছে প্রমাণ করতে না পার, তাহলে তার সঙ্গে ধর্মের কোন সংস্রব নেই। তা আর যাকিছু হোক, তা ধর্ম হতে পারে না—তা ধর্ম নয়। রামকৃষ্ণদেবের কাছে নরেন্দ্রনাথ এই প্রশ্ন নিয়েই এসেছিলেন। রামকৃষ্ণদেকে তিনি যুক্তিবাদীর ভাষায় 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেব সহাস্যে সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথের এমন কথায় তিনি খুশী হয়েছিলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের কাছে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন তাঁর উপলব্ধি, তাঁর অনুভূতি এবং তাঁর দর্শন যুক্তি ও বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এই যুক্তি ও বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ্যে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ, এ স্বসংবেদ্য অর্থাৎ নিজেকে সাধনসহায়ে উপলব্ধি করতে হয়। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। রামকৃষ্ণ মিশন কলকাতা স্টুডেন্টস হোম-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী নির্বেদানন্দের ছাত্রজীবনে সহপাঠী ছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু। একবার তাঁরা পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে কলকাতার বেলঘরিয়ায় স্টুডেন্টস হোম-এ গিয়েছেন। স্টুডেন্টস হোম-এর সামনের মাঠে একজন চাষী তখন লাঙল দিচ্ছিল, ধর্মসূত্রে যে ছিল মুসলমান । বিজ্ঞানাচার্যগণ তাঁদের সন্ন্যাসি-বন্ধুকে বললেন : ''কী সব ধর্মটর্ম নিয়ে জীবনটা কাটালে! কী লাভ হলো তাতে? তুমি তোমার ধর্মের গভীর তত্ত্বকে কি মাঠের ঐ চাষীকে বোঝাতে পার?'' স্বামী নির্বেদানন্দ পাল্টা প্রশ্ন করলেন : ''তোমরা কি তোমাদের অ্যাসট্রো-ফিজিক্সের লেটেস্ট থিয়োরিটি ওকে বোঝাতে পারবে?'' তাঁরা বললেন : ''না, তা পারব না। কারণ, তা বুঝতে গেলে যে-পড়াশুনো দরকার, যে বৌদ্ধিক প্রস্তুতি দরকার, তা ওর নেই।'' স্বামী নির্বেদানন্দ হেসে বললেন : ''এক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ধর্মের গভীর তত্ত্ব বুঝতে গেলেও যে-সাধনা দরকার, যে-মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি দরকার তা ওর নেই। যখন তা হবে তখন ওকে আমি বোঝাতে পারব বা ও আমার কথা বুঝতে পারবে।'' বস্তুত, ধর্ম এমন একটি বিষয় যা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয়। সেই অনুভূতি হলো এক দিব্য প্রেরণা যা আমাকে পবিত্র করে, নিঃস্বার্থ করে, আত্মত্যাগে উদ্দীপ্ত করে, অপরের প্রতি পরম প্রেমে প্রাণিত করে। ধর্ম হিংসার মূলোচ্ছেদ করতে মানুষকে প্রেরণা দেয়। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ওঠার শিক্ষাই ধর্মের শিক্ষা। ধর্ম মানুষকে বিরাট দুঃখকে অবলীলায় সহন করতে শেখায়, আবার পরম আনন্দের মুহূর্তে নির্বিকার থাকতে শেখায়। 'গীতা'য় দেখি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। এই অবস্থানে যাওয়াকে ধর্মের লক্ষ্য বলে শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেও ছিলেন সেই অবস্থার জীবন্ত বিগ্রহ। বস্তুত, সব ধর্মের মহান আচার্যগণ প্রত্যেকেই তা-ই। ধর্ম কোন অলৌকিক বা অতিলৌকিক বিষয়ে মানুষকে বিশ্বাস করতে বলে না। ধর্ম যে-অলৌকিকত্বকে মানে তা হলো মানুষের চারিত্রিক পরিবর্তন। ধর্ম বলে, তুমি তোমার মধ্যে তোমার নিজস্ব শক্তির বিকাশ ঘটাও। তুমি স্বয়ং বিধাতা হও। ধর্ম এই বিধাতা-নির্মাণের মন্ত্র মানুষকে দেয়। শুধু বিধাতা কেন—বিধাতার চেয়েও যদি কেউ বড় থাকেন, ধর্ম তাই হতে মানুষকে প্রেরণা দেয়। বুদ্ধ, খ্রীস্ট, চৈতন্য সেই ধরনের মানুষ, যাঁদের সমক্ষে বিধাতার গৌরবও ম্লান হয়ে যায়। ধর্মের মূলতত্ত্ব তাই হলো বুদ্ধ হওয়া, খ্রীস্ট হওয়া, চৈতন্য হওয়া। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, বুদ্ধ, খ্রীস্ট প্রমূখ কোন ব্যক্তি নন, তাঁরা মানব-বিকাশের সর্বোচ্চ অবস্থার নাম। সেই বিকাশ যখন কারও মধ্যে হয়, তখন সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ঈশ্বরসদৃশ হয়ে যান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : এমন মানুষ আছে, যে-মানুষ শালগ্রামের চেয়েও বড়।

'শালগ্রাম' অর্থাৎ নারায়ণ শিলা। 'নারায়ণ' অর্থাৎ ঈশ্বর বা ভগবান। নারায়ণ শিলা সুতরাং ভগবানের প্রতীক। বুদ্ধ, খ্রীস্ট অথবা তাঁদের সদৃশ ব্যক্তি সেই ভগবানের প্রতীক বা ভগবানতুল্য ব্যক্তি। মানুষই নিজের ঐশ্বর্য বিকাশের মাধ্যমে তা-ই হয়ে যায়। যে-পদ্ধতিতে তা হয় সেই পদ্ধতিই ধর্ম বা ধর্মবিজ্ঞান। সুতরাং ধর্মও একটি বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান সেই স্তরে বা সেই অবস্থায় মানুষকে পৌঁছে দেয়।

অবতার, মহাত্মা, সন্ত-সাধকগণ, শাস্ত্র এই কাহিনীই আমাদের উপহার দিয়েছেন। মানুষের মধ্যেই ভগবান, মানুষই দেবতা, মানুষই নিজের ভাগ্যনির্মাতা। মধ্যযুগের বাঙালী কবি চণ্ডীদাস উদাত্ত কণ্ঠে শোনালেন : "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" মানুষের এই জয়গানের মাধ্যমে পৃথিবীতে আধুনিকতার পদধ্বনি শোনা গেল। তার আগে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে আমরা শুনেছি দেবতা ও দেবীদের মহিমাকীর্তন। ইটালীর নবজাগরণ এনে দিল মানুষের মহিমার গাথা। মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির শিল্পকর্ম সেই গাথারই রূপায়ন। পাশাপাশি সমকালে বাংলায় সেই গানই শোনালেন কবি চণ্ডীদাস। তাঁর কবিতায় ঈশ্বরের জয়গান নয়, মানুষের জয়গান শোনালেন তিনি। শ্রীচৈতন্যের ধর্মান্দোলনে তো মানুষের জয়গানই আমরা শুনি। পরবর্তিকালে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখের ভজনসঙ্গীতেও মানুষের মহিমা ও শক্তির প্রশস্তি। অবশেষে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁরা এই মানব-মহিমা কীর্তনে এনে দিলেন পরম পূর্ণতা। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে একদিকে রয়েছেন ধনী কামারনী, শ্রীনিবাস বা চিনু শাঁখারি, রসিক মেথর, শেখ উমেদ আলি, পরিচারিকা বৃন্দা, আমজাদ, নিম্নবর্গীয় পীতাম্বর, সাঁওতাল কেষ্টা প্রমূখ। অন্যদিকে রাসমণি, মথুরামোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, বলরাম বসু প্রমূখ। তাঁদের কেউ কেউ বিত্তবান হলেও অধিকাংশই দরিদ্র, নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষ। এই ভাবান্দোলনে বিদেশীরাও ছিলেন। ফ্রেডেরিক এফ. ম্যাক্সমূলার, মিসেস সারা ওলি বুল, মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড, মিঃ ফ্রান্সিস লেগেট, মাদাম কালভে, উইলিয়াম জেমস, মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল, ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেল, মিস হেনরিয়েটা মূলার তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই প্রথম ধর্মের অসাম্প্রদায়িক আহ্বানে সবাই এসে মিলিত হলেন এই ভাবান্দোলনের ছত্রছায়ায়। এই আন্দোলনের আহ্বান মানবধর্মের।

বস্তুত, মানবধর্ম কখনো সাম্প্রদায়িক দেশগত, বর্ণগত, কালগত গণ্ডিতে বদ্ধ থাকে না, থাকতে পারে না। এই ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভাজন স্বীকার করে না। এই ধর্মে বেদ নেই, ত্রিপিটক নেই, বাইবেল নেই, কোরান নেই। অথচ তাদের সকলের মর্মধ্বনি তার মধ্যে বিরাজমান। স্বামী বিবেকানন্দ সেই ধর্মের স্বপ্ন দেখেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ধর্মের উদ্গাতা। মা সারদাদেবী সেই ধর্মের নিত্যদিনের রূপকার। ধর্মের এটিই ঐতিহ্য। শ্রুতি–স্মৃতি–ন্যায় ঐ ঐতিহ্যের কথা স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের শোনাচ্ছে। তাঁরা ঐ ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক এবং অবতার ও আচার্যবৃন্দ ঐ ঐতিহ্যের মূর্ত বিগ্রহ। ঐ ঐতিহ্য মানব-নির্মাণের সুমহান আদর্শ আমাদের সামনে স্থাপন করেছে। সেই আদর্শ দেবতা হওয়ার, ঈশ্বর হওয়ার। সেই আদর্শ প্রতি মুহূর্তে অধিকতর দেবত্ব-বিকাশের, ঈশ্বরত্ব-বিকাশের আদর্শ। ধর্ম এই ঐতিহ্যের, এই চরিত্র-বিকাশের চিরন্তন উৎস। তাই ধর্মই মানুষের চিরন্তন রক্ষাকবচ।

ধর্মকে বাদ দিলে কি থাকে মানুষের সমাজে? স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, ধর্মহীন সমাজ জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়। জঙ্গলে জানোয়াররা থাকে। মানুষের সমাজ তখন মানুষ নয়, জানোয়ারে পূর্ণ হয়ে যায়। আকারে তারা মানুষ অবশ্যই, কিন্তু প্রকারে তারা জানোয়ার। জানোয়াররা যেমন দেহের সুখেই আনন্দ পায়, ধর্মহীন মানুষেরাও তাই। 'হিতোপদেশ'-এ বলা হয়েছে : আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সমানমেতৎ পশুভির্নরাণাম্। / ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।। —আহার, নিদ্রা, ভয় ও জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়না — এগুলি পশু ও মানুষ উভয়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ধর্মই একমাত্র মানুষের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য। ধর্মহীন মানুষ পশুর সমান। এটি যদি ধর্মের বৈশিষ্ট্য হয় তবে ধর্ম কি কখনো সমাজে অপ্রাসঙ্গিক হতে পারবে? ধর্ম সেজন্য সমাজে এখন প্রাসঙ্গিক, অতীতেও প্রাসঙ্গিক ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। যতদিন মানবসভ্যতা থাকবে ততদিন ধর্মও থাকবে প্রাসঙ্গিক। □